ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1131-1137
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.331

দেবমহিমা প্রচার নাকি নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিরন্তন প্রচেষ্টা: প্রসঙ্গত মঙ্গলকাব্যের পটভূমি

বিউটি রুদ্র, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explores the representation of women's self-assertion in Bengali Mangal-Kavya within a predominantly patriarchal social framework. While these medieval texts are often interpreted as narratives glorifying deities, a deeper reading reveals the persistent struggle of female characters for identity, dignity, and recognition. Through an analysis of texts such as *Manasamangal*, *Chandimangal*, *Dharmamangal*, and *Annadamangal*, the study highlights how figures like Manasa, Behula, Chandi, and others embody resistance against social, familial, and religious constraints. These women challenge established norms, assert autonomy, and negotiate power within restrictive structures. The paper situates these narratives within the socio-political context of medieval Bengal, marked by religious transitions and social stratification. It argues that beneath the veneer of divine glorification lies a discourse of gendered agency and empowerment. Thus, Mangal-Kavya becomes a significant literary site for understanding early expressions of women's selfhood and resistance in Bengali literature.

Keywords: Mangal-Kavya, Women's Agency, Patriarchy, Medieval Bengal, Self-Assertion

জন্মলগ্ন থেকেই জীবের অস্তিত্ব রক্ষার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। কখনো খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের জন্য সংগ্রাম আবার কখনোবা সমাজের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মুখীন হতে হয় এক দুর্বিষহ লড়াইয়ের। এই প্রচেষ্টা আজকের আধুনিক যুগের ফসল নয়, মধ্যযুগের কাব্যাকাশে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে জন্ম নেওয়া মঙ্গলকাব্যগুলির আঁতের কথা। সাধারণভাবে দেখলে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে দেবতার জয়গান। কিন্তু এই সকল কাহিনির অতলগহ্বরে ডুব দিলে দেখা যায় সেখানে রয়েছে তৎকালীন সমাজের কথা, রয়েছে চরিত্রগুলির আত্মপ্রতিষ্ঠার চিরন্তন দাবি।

বাংলা সাহিত্যের জগতে যখন আবির্ভাব ঘটে মঙ্গলকাব্যের, তৎকালীন সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে এক রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিহাস। এই সময়ে ঔপনিবেশিক ইসলামিক শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে ধর্মীয় আগ্রাসন। জরাসন্ধের দেহসন্ধির দুর্বল অংশে ভীমের আঘাত হানার মতো বৈষম্যদীর্ণ বাঙালি জাতির শিথিল হয়ে আসা সামাজিক ঐক্যের গ্রন্থিতে আঘাত হেনেছিল দুর্বার বৈদেশিক শক্তি। এই শৈথিল্য একদিনে আসেনি। এর পিছনে আছে বহু প্রাচীন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান, বৈদিক আর্য ধর্মের সঙ্গে সামাজিক সংঘাতের ফলশ্রুতি। উন্নাসিক আর্য সংস্কৃতির চোখে এদেশে বসবাসকারী মানুষদের অবস্থান ছিল অশ্রদ্ধাজনক। ফলত দীনেশচন্দ্র সেন কথিত 'বৃহৎবঙ্গ'-এর সুবিশাল

ভূখণ্ডের মধ্যে আর্য ও অনার্যের মিলন সম্ভব হয়নি। দেখা যায় বর্ণ বিভাজন। এইরকম এক সামাজিক প্রেক্ষিতের হাত ধরে পাল বংশ থেকে সেন বংশের রাজত্বকালে রাজাদের নানা পালা বদল ঘটলেও সমাজে বর্ণবৈষম্য ছিল চূড়ান্ত। এইরূপ বর্ণবৈষম্যের করালগ্রাসে জর্জরিত সমাজে যখন ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করেন, তখন খুব সহজেই তিনি পরাজিত করেন তৎকালীন বাংলার মসনদের অধিপতি লক্ষ্মণ সেনকে। এই পরাজয়ের নেপথ্য ভূমিতে ছিল উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের সংযোগহীনতা। যার ফলে এক রাজা গিয়ে অন্য রাজার আগমন ঘটলে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসতো না। এছাড়াও রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন আরাম প্রিয় বিলাসী মনোভাবাপন্ন। তুর্কি আক্রমণকে প্রতিহত করবার মতো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না তৎকালীন শাসকের। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের হাতে ছিল না অর্থ। তুর্কি আক্রমণের প্রভাব তাই সাধারণ মানুষের থেকে বেশি পড়েছিল তখনকার ধনকুবেরদের রাজধানী তথা মন্দিরগুলিতে। এই মন্দিরের অধিপতি ব্রাহ্মণদের উপর চলতে থাকে অকথ্য অত্যাচার। একটানা এই ভাঙা ভাঙা আর ভাঙার হাত থেকে নিস্তার পেতে সাধারণ মানুষ চেয়েছিল শক্তিশালী আশ্রয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পাল যুগ থেকে পূজিত হয়ে আসা শিব আর মানুষকে দিতে পারছেন না সেই নিরাপদ আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই লিখেছেন,

> "বস্তুত সংসারিক সুখ-দুঃখ বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্ট দেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারেনা।"[১]

একইভাবে আশ্রয় দিতে অক্ষম মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ। ফলত সেই ঝড়-ঝঞ্ঝাকালে বিপর্যস্ত পরিবেশে আশ্রয় দিতে আবির্ভাব ঘটেছিল শক্তির। ক্ষমতা যার কোনো সীমায় ধরা যায় না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার কোনো নিয়ন্ত্রণ মানে না। যা সহজেই মানুষকে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠাতে পারে আবার তেমনি সহজেই ডোবাতে পারে অন্ধকারের অতল গহবরে। এমন এক শক্তির স্বরূপ মানুষের মনে স্থান পেয়েছিল যা তাদেরকে সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম। আর তখনই আশ্রয়দাত্রী হয়ে ধরা দিয়েছিলেন মনসা, চণ্ডী, অন্নদা প্রমুখরা। মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় নারীদের আশ্রয়দাত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই ছবি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বুকে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকেই যেন ঘোষণা করে যায়। একবিংশের পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনি কি শুধুই দেব মহিমা প্রচার নাকি এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সেই চিরন্তন প্রচেষ্টা?

মধ্যযুগের রচিত হওয়া মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'মনসামঙ্গল'। এই কাব্যের নামকরণ থেকে শুরু করে কাহিনির পরতে পরতে লেখকের লেখনি এক অযোনিসম্ভূতা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই তুলে ধরেছে। সে বিপ্রদাসের লেখনী হোক বা বিজয়গুপ্ত কিংবা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের প্রেয়সী কলমই হোক। তুর্কি আক্রমণের প্রেক্ষাপটে এক অযোনিসম্ভূতা নারীর আশ্রয়দাত্রী হয়ে ওঠার কাহিনির অন্তরালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীর দুর্বার লড়াই যেন 'মনসামঙ্গল কাব্য'-কে নব জন্ম দিয়েছে। তিনি শিবের মননজাত কন্যা। যাঁর জন্মলগ্নে হয়নি কোনো শঙ্খধ্বনি। জন্ম থেকেই পিতা শিব তাঁর কন্যাকে চেনেন না। তাই মনসা যখন মহাদেবের সামনে উপস্থিত হন তখন "দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম-চীতে।"[২] পিতার কাছেও সন্তানের এই নিরাপত্তাহীনতা। আত্মসম্মান রক্ষার্থে যে সন্তানকে তাঁর পিতার কাছে নিজের পরিচয় দিতে হয়, সেই সন্তান বড়ো অসহায়। এই অসহায়তা তাঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারেনি বরং নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতেই মনসা হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য। তাই পিতাকে জানিয়েছেন "তব সঙ্গে চলে যাব যথা নিজে ঘর।"[৩] তখন দেবী চণ্ডীর কোপকে স্মরণ করে শিব তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে যান পুষ্পের মধ্যে লুকিয়ে। এমনভাবে গৃহপ্রবেশ তাঁর অন্তর্দহনের জ্বালাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সেখানে গিয়েও মেলেনি তাঁর আশ্রয়। বিতাড়িত হন চণ্ডীর দ্বারা। অবশেষে ঠাঁই মেলে সিজুয়া পর্বতে। এমনকি মা চণ্ডীর কোপদৃষ্টিতে স্বামী সুখ থেকেও হন তিনি বঞ্চিত। পিতৃ, মাতৃ, স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর লড়াই শুরু হয় এখান থেকেই। দেব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য শিব উপাসক

চাঁদ বনিকের পুজো পেতে শুরু হয় তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম। তবে সেখানেও মেলেনি তাঁর যথার্থ সম্মান। চাঁদের কাছ থেকে পুজো পেতে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করে যান। মহাজ্ঞান হরণ, গুয়াবাড়ি ধ্বংস, ধন্বন্তরি বধ, ছয় পুত্রের প্রাণ হরণ, সপ্তডিঙা ডুবি, চাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিনাশ, মর্ত্যে অনিরুদ্ধ, ঊষার লখিন্দর ও বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ সবই তাঁর প্রচেষ্টার জ্বলন্ত উদাহরণ। এতো প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার ফল হিসাবে অবশেষে-

"অনেক প্রকারের স্তুতি করে চাঁদো রাজা
নানা বিধি প্রকারে করয়ে পদ্মা-পূজা।"[৪]

মনসা প্রতিষ্ঠা পান দেব সমাজে। এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই আর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর যে আন্তরিক ইচ্ছা এবং শেষ অবদি তাঁর স্বপ্নপূরণ- এ কোনো দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনি নয়, এই কাহিনি এক সাধারন নারীর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার লড়ায়ের কথাকেই তুলে ধরে, যা আজও নারীদের মধ্যে বর্তমান। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, নিজের অধিকারের যথাযথ মর্যাদা আদায়ের জন্য মনসার যে লড়াই তা তো বর্তমান সমাজে ঘরে বাইরে সামলানো কোনো নারীর থেকে কম নয়। শুধু মনসাই নন, চণ্ডী, নেতো, বেহুলা, সনকা সকলই আপন আপন চেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপানে নিজেদের জয়গান ঘোষনা করেছেন। চণ্ডীর তাঁর স্বামীর প্রতি সন্দেহ জাগলে সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা এক আধুনিক নারীরই লক্ষণ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামী যেখানে ইহকাল-পরকাল, সেখানে চণ্ডীর এই স্বতন্ত্র মনোভাব তাঁর আত্মমর্যাদা ও নিজ অধিকারের দাবিকেই প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে নেতো মনসারই মতো এক অযোনিসম্ভূতা নারী। শিবের চোখের জলে যাঁর জন্ম। এই নেতো শুধু বাঙালি পরিবারের অসহায় বোনের নির্ভরশীলা দিদি নন, একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন নারী। যিনি নিজের বোনকে প্রতিষ্ঠা দিতে তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী–

"শুনিয়া পদ্মার বাণী করে লৈল খড়িখানি
গনে নেতা এ তিন সংসার।"[৫]

মনসার প্রতিষ্ঠার জন্য নেতো তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে। নেতো হয়ে উঠেছেন একজন যথার্থ পরামর্শদাত্রী। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলেই মনসা পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা। এক অযোনিসম্ভূতা নারী হয়ে নেতোর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজের বুকে এই বার্তাই ঘোষণা করে যে নারী অসহায় বা অবলা নন। তিনি নারী, তাই তিনি সমগ্র বাধা অতিক্রম করে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন। অন্যদিকে সনকা ও বেহুলা আধুনিক নারী থেকে কোনো অংশে কম নয়। সনকা শুধু চাঁদ সওদাগরের গৃহকত্রী নন, তাঁর পুত্রদের মা নন, সর্বোপরি তিনি একজন নারী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তখন। চাঁদ বণিক সেই সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও চাঁদকে পুত্রহন্তা হিসাবে সনকা তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত করেছেন গঞ্জনার শ্লেষমালা– "সর্বনাশ হৈল রাজা তোর দম্ভদোষে।"[৬] আবার লক্ষিন্দর যখন সর্পদংশনে মারা যান, তখনও সনকা চাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান দৃঢ় কণ্ঠে–

"বিধির করম-ফলে সেই স্বামী মরে মিলে
অবুদ্ধিইয়া চাঁদো নৃপবর।"[৭]

এই সনকা মধ্যযুগের পতি স্বর্গ পতি ধর্ম বাতাবরণের বেড়াজাল ভেঙে স্বামীর কর্মের প্রতিবাদ করতে জানেন। আবার নিজের সম্মান রক্ষার্থে নিজেরই চারিদিকে রচনা করেছেন এক সুরক্ষার চক্রব্যূহ। তাঁর পাঁচ মাস গর্ভাবস্থায় চাঁদ যখন বাণিজ্যে যেতে চান, তখন সনকা বলেন–

"লোক ধর্ম্মচারে পাছে হয় অপমান
তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।"[৮]

নারীত্বের অহংকারকে কলঙ্ক মুক্ত রাখতে সনকার এই পদক্ষেপ তাঁর ব্যক্তিস্বতন্ত্রেরই পরিচয় দেয়। অন্যদিকে বেহুলা নারী স্বতন্ত্রের মূর্তিময় প্রতীক। যিনি সমাজের নিয়ম নীতিকে পিছনে ফেলে মৃত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গযাত্রা করে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ– "জীয়াইয়া প্রভুরে আসিব পুনর্বার।"[৯] যাত্রাপথে সকল বাধাকে অতিক্রম করে ফিরিয়ে আনেন স্বামীর প্রাণ। পুজো দিতে বাধ্য করেন চাঁদকে-

"বেহুলার বাক্য শুনি বলিল রাজন
পূজিব পরম ভক্তি মনসা চরণ।"[১০]

এই বেহুলা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে সদা প্রতিজ্ঞ। ইনি কোনো মধ্যযুগীয় নারী নন, মধ্যযুগের আবহাওয়ায় লালিত আধুনিক নারীর নব সংস্করণ। সমগ্র 'মনসামঙ্গল' কাহিনিতে ডুব দিলেই দেখা যাবে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি। দেব কথার মাহাত্ম্য ছেড়ে যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা নারীর লড়াইয়ের গোপন কথার ঘনযামিনী হয়ে উঠেছে 'মনসামঙ্গল'এর কাহিনি।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের ধারা পথে 'চণ্ডীমঙ্গল' এক বিশেষ সময়ের সাহিত্য ফসল। এখানে দেবী চণ্ডী দেবাদিদেবের ঘরণী তবুও মর্ত্যে পুজো প্রচারের জন্য নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। যা বর্ণিত আছে 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড' নামক 'চণ্ডীমঙ্গল' এর দুই খণ্ডে। 'আখেটিক খণ্ড'-এ দেখা যায় দেবী চণ্ডী তাঁর পুজো প্রচারের জন্য যে পরিকল্পনা করেন তাতে নীলাম্বর ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু রূপে এবং তাঁর পত্নী ছায়া ফুল্লরা রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। কালকেতুর হাত থেকে বন্য পশুদের রক্ষার্থে চণ্ডী সুবর্ণ গোধিকার ছদ্মবেশ নেন। ব্যাধ কালকেতু তাঁকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে সেই স্বর্ণগোধিকা ফুল্লরার সামনে অপূর্ব রমনীর রূপে উপস্থিত হন। তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলে– "আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুনে।"[১১] জীবনে শত অভাব অনটনেও যে ফুল্লরা স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনেননি, সতীন ঘরে এসেছে ভেবে নারীত্বের অপমানের জ্বালায় স্বামীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন গঞ্জনা বাণ–

"পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।।"[১২]

মধ্যযুগের বাতাবরণে ফুল্লরার এহেন প্রতিবাদ নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকেই তুলে ধরেছে। অপরদিকে 'বণিক খণ্ড'-এ ধনপতি বণিকের দুই স্ত্রী- লহনা ও খুল্লনা। লহনা খুল্লনার সতীন বলে তাঁর বিনাশ ঘটানোর জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর। অপরদিকে খুল্লনার ত্যাগ, দুঃখ-দহন বাস্তব বলে মনে হয়। এই দুইজন দুই ভিন্নধর্মী নারী। এই নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বহু পত্নিক বণিক রাজার ঘরণী। নারী স্বতন্ত্রতার প্রকৃত মহিমায় তাঁদের মহিমান্বিত করা যায় কিনা এ নিয়ে পাঠক মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তবুও খুল্লনার বুদ্ধিমত্তা, সন্তানকে পরামর্শ দেওয়া, দেবী চণ্ডীর কাছে বর চাওয়ার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে ব্যক্তিস্বতন্ত্রের প্রদীপ জ্বলে উঠলেও তিনি মনসা, বেহুলা, চণ্ডী, সনকা বা ফুল্লরার মতো আলো দান করতে পারেননি। অন্যদিকে দুর্বলা অনেক বেশি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে, নিজের চাওয়া-পাওয়াকে সত্য করে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই দুই সতীনের ঘরে কলহ সৃষ্টি করেন তিনি। কারণটাও স্পষ্ট–

"লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি
পাটী করি মরিব দুজনে দিব গালি।।"[১৩]

দুর্বলা হয়ে উঠেছেন লহনার পরামর্শদাত্রী। লহনার সাধভক্ষণ, শ্রীমন্তের জন্ম, শিক্ষা আরম্ভ সবেতেই লহনার ছায়াসঙ্গী তিনি। তিনি চতুরা, পরশ্রীকাতর, আবার মমতা ও কর্মদক্ষতাও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন

সমাজে ভাগ্যবিড়ম্বিত দুর্বলার অপরের বাড়িতে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁর যে কৌশল গ্রহণ, তা তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে অনেকখানি মহিমা দান করেছে। আপন মনের মাধুরী মিশে তিনি রচনা করেছেন আপনার জগৎ। সমগ্র 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ দেবী চণ্ডী থেকে শুরু করে ফুল্লরা, খুল্লনা, দুর্বলা প্রতিটি নারী চরিত্রই আজীবন সংগ্রাম করেছেন নিজের কথাটাকে নিজের মতো করে বলবার জন্য। নিজের নারীত্বের সম্মান রক্ষার্থে, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠাতে, কখনো ধনাত্মক কখনোবা ঋণাত্মক পথে পাড়ি দিয়েছেন এই নারীরা। দেখতে চেয়েছেন নিজের ক্ষমতাকে পরখ করে। এই কষ্টিপাথরের যাচাই শুরু হয়েছে সেই মধ্যযুগের পটভূমিতে, যা আজও চলছে।

'মনসামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর মতো 'ধর্মমঙ্গল' কোনো নারী দেবতার পুজো প্রচারের কাহিনি নয় বরং এই কাব্যটি এক পুরুষ দেবতার মর্ত্যে পুজো প্রবর্তনের অমর গাথা। এই গাথার অন্তরালে যে সকল নারী চরিত্র স্থান পেয়েছেন তাঁরা কি তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছেন নাকি মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার অতল সমুদ্রের অভিযাত্রী হয়েই থেকে গেছেন? ধর্ম ঠাকুরের পুজো প্রবর্তনের জন্য দেব নর্তকী জাম্ববতীকে স্বর্গভ্রষ্ট করে মর্ত্যে পাঠানো হয়। এক পুরুষ দেবতার পুজো প্রচারের ভার পড়ে এক নারীর উপর। পিতৃতান্ত্রিক বাতাবরণে এ নারীর ক্ষমতায়নেরই জয়গান। জাম্ববতী মর্ত্যে ধারণ করেন রঞ্জাবতী নাম। তাঁর ভাই মহামদ বা মাহুদার অমতেই গৌড়েশ্বর তাঁর বিবাহ দেন ঢেকুরের অধিপতি কর্ণসেনের সাথে। মাহুদার দ্বারা তাঁর স্বামী অপমানিত হলে রঞ্জাবতীর প্রতিজ্ঞা: এমন ভাইকে আর তিনি স্থান দেবেন না মনে। স্বামীর অপমানে নারীর এ এক তীব্র প্রতিরোধ। কিন্তু রঞ্জাবতী নিঃসন্তান। সামুল্যা কথিত হরিশচন্দ্র ও মদনার কাহিনি শ্রবণ করেন তিনি। এই উপকাহিনির নায়িকা মদনাও একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। যিনি তাঁর নিজের কথার মর্যাদা রাখতে বুকে পাথর চাপা দিয়ে তাঁর সাত রাজার ধন এক মানিক লুইধরকে নিজের হাতে কেটে রান্না করে নিবেদন করেন ধর্মঠাকুরকে। এই উপকাহিনি শ্রবণ করে রঞ্জাবতীর পুজো করেন ধর্মের। জন্ম নেন লাউসেন। ঘটনা এগোলে লাউসেনের সঙ্গে পরিচয় হয় কালু ডোম ও তাঁর স্ত্রী লখাই-এর। এই লখাই মাহুদ্দা ময়নাগড় আক্রমণ করলে যুদ্ধ করেন এবং বীরাঙ্গনার মতো প্রাণ ত্যাগ করেন। এক নারীর পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই পথ চলা নারীর স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠা হওয়ার দাবিকেই সিদ্ধ করে।

'ধর্মমঙ্গল' এক পুরুষ দেবতার পুজো প্রচারের কাহিনি। তাই একবিংশের একজন পাঠিকা হয়ে যখন নারীর চোখ দিয়ে 'ধর্মমঙ্গল' পাঠ করি তখন মনে হয় এটা শুধুই একটা কাহিনিকে ফিরে দেখা নয়, এই কাহিনির রি-ভিজনিজম। নারীর চোখ দিয়ে নবরূপে দেখতে চাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ছবিটা নারীর অন্তরে যেন জন্মসূত্রেই গেঁথে যায়। তাই যখন সেই সমাজের দিকটাকে লঙ্ঘন করে নারীর দৃষ্টিতে 'ধর্মমঙ্গল'কে দেখি, তখন মনের মধ্যে সঞ্চার ঘটে নানান প্রশ্নের। ধর্মের পুজো প্রচারের জন্য যে জাম্ববতী রঞ্জাবতী হয়ে মর্ত্যে এসেছিলেন তাঁর জন্ম বর্ণনা থেকে বড়ো হয়ে ওঠা কয়েকটি চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? কাব্যটিতে তার বর্ণনা এসেছে এভাবে –

> "রম্ভা এসে তার গর্ভে লভিল জনম।।
> দিবস গণনা ক্রমে নয় মাস গেল।
> পূর্ণ হতে দশমাস প্রসব হইল।।"[১৪]

কেন ষষ্ঠী পুজো, অন্নপ্রাশনের পর তাঁর ষোড়শী হয়ে ওঠা? কাব্যটি তা ফুটে উঠেছে এভাবে-

> "বাড়ে রঞ্জা বিগ্রহেতে বাপের সদনে।
> শুক্লপক্ষে শশধর সম দিনে দিনে।।

কায়কান্তি কমনীয় কামধনু ভুরু।
রামরম্ভা হব অতি সুগঠন উরু।।"[১৫]

যেখানে লাউসেনের জন্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য 'বাঘেরজন্মপালা', 'বাঘবধপালা' দুটি স্বতন্ত্র পালার আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানে রঞ্জাবতীর জীবন বর্ণনা কয়েকটি পঙক্তির অন্তরেই আত্মগোপন করেছে। এই সময়পর্বে অন্ত্যজ শ্রেণির মেয়েরা অনেক বেশি পরিশ্রমী ছিলেন পুরুষদের থেকে। লখাই ও কালু ডোমের কাহিনিতে নারী অনেক বেশি অগ্রবর্তী। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল লখাই। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আঙ্গিক থেকে সব মিলিয়ে দেখলে 'ধর্মমঙ্গল'-এর এক নতুন পাঠ তৈরি হয়, যেখানে সমাজ ব্যবস্থার ক্রমান্বয়িক পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ আজও রয়ে গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গলকাব্যের আঙিনায় ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল'এর আধিপত্য চোখে পড়ে। যিনি অন্ন দান করেন, তিনিই অন্নদা। সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে তাঁর। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবী অন্নদার প্রতিষ্ঠার কাহিনি নয়, স্ত্রী উমার অন্নদা হয়ে ওঠার মধ্যে এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তার প্রতিফলন 'অন্নদামঙ্গল'কে নবরূপ দান করেছে। শিব-জায়া সতী দক্ষরাজের কন্যা। পিতার অসম্মতিতে কন্যা বিবাহ বিবাহ করায় বঞ্চিত হন দক্ষযজ্ঞের নিমন্ত্রণ থেকে। তবুও পিতার গৃহে যাত্রা করলে সতীকে শুনতে হয় স্বামী নিন্দা। পতি নিন্দা সতীর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানলে তিনি আত্মহননের সংকল্প করেন এবং পিতাকে বলেন–

"যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।"[১৬]

দেহত্যাগ করেন সতী। জন্ম নেন গিরিরাজের ঘরে গৌরী রূপে। শিবের সাথে হয় বিবাহ। কিন্তু কামলোলুপ, অকর্মণ্য স্বামীর জন্য সংসারের চিন্তায় তাঁর দিন আর অতিবাহিত হয় না। সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। শিব তাঁকে সংসারের দুর্দশার জন্য গঞ্জনা দিলে তা তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত হানে। তখন স্বামীর দিকে নিক্ষেপ করেন তিক্ত কথার রংমশাল–

"অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্ব কালি ধন কই।।"[১৭]

এই একই সাংসারিক চিত্রের দেখা মেলে 'শিবায়ন কাব্য'-তে। সংসার নির্বাহের ক্ষেত্রে শিবের দায়িত্বহীনতা গৌরীকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। শুধু 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' নয়, 'শিবায়ন কাব্য'-তেও দেখি সেই ছবি–

"শিবা বলে সেই যে সম্পদ দিয়াছিলে।
মনে কর মহাপ্রভু কতকাল খাল্যে।।
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিনীর গুনে।
ফেল্যা দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে।।"[১৮]

পতি পত্নীর এই কলহ উভয় কাব্যেই বর্তমান। সংসারের দুর্দশার জন্য একদিকে যেমন স্বামীকে গঞ্জনা করেছেন তেমনি অপরদিকে আবার অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ করে মিটিয়েছেন স্বামীর জঠোর-জ্বালা। বর্তমান সমাজ-সংসারে নারীদের এই অন্নদাত্রী রূপ বিদ্যমান। নারী-পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন সংসারের ভার। সমান ছন্দে নির্বাহ করেছেন ঘরে-বাইরের দায়িত্ব। সীমা থেকে অসীমে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের স্বপ্নকে। মধ্যযুগের কোলে জন্ম নেওয়া অন্নদা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে যে পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আজকের আধুনিক নারীরাই তার ধারক ও বাহক।

প্রবন্ধ পরিশেষে তাই বলাই যায়, আজ আধুনিক নারীরা যে সর্বসমক্ষে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রস্তুত, নিজের স্বপ্নের উড়ানকে অসীমের সীমাহীনতায় পৌঁছে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; সেই স্বপ্নের বীজ বপন হয়েছিল মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মহাকাশে। এখানে মনসা, নেতো, সনকা, চণ্ডী, ফুল্লরা, লহনা, দুর্বলা, রঞ্জাবতী, লখাই ডোম, অন্নদা তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের হৃদয় বিদীর্ণ করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন অসাধারণ মেধা শক্তি ও পরিশ্রমী মনোভাবের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সময়টা তখন ছিল অস্থির। শাসকের পালাবদলে বাংলার সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বিপর্যস্ত। তাই সেই সময়ের কথাকে সরাসরি না বলে লেখকরা ব্যবহার করলেন ধর্মকে মুখোশ হিসাবে। যাকে বাহ্যিকভাবে দেখলে মনে হয় এই কাহিনিগুলি দেব মাহাত্ম্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এর গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে তৎকালীন সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে দেব মাহাত্ম্যের মোড়কে মুড়ে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কথাকেই যেন ঘোষনা করে চলেছে উদাত্ত কণ্ঠে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য প্রবন্ধ সংকলন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী, পৃ. ১৫।
২. সেন, সুকুমার (সম্পা.)। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, খণ্ডিত, পৃ. ১৫।
৩. তদেব, পৃ. ১৫।
৪. তদেব, পৃ. ২৩০।
৫. তদেব, পৃ. ৫৮।
৬. তদেব, পৃ. ১৩২।
৭. তদেব, পৃ. ২১১।
৮. তদেব, পৃ. ১৪০।
৯. তদেব, পৃ. ২০৫।
১০. তদেব, পৃ. ২২৯।
১১. সেন, সুকুমার (সম্পা.)। কবিকঙ্কন মুকুন্দ– বিরোচিত: চণ্ডীমঙ্গল। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৬০।
১২. তদেব, পৃ. ৬২।
১৩. তদেব, পৃ. ১৩১।
১৪. দত্ত, বিজিত কুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পা.)। মানিকরাম গাঙ্গুলী (বিরচিত): ধর্মমঙ্গল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩২।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৩।
১৬. মজুমদার, ভবেশ। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩২।
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৯।
১৮. মন্ডল, দয়াময় (সম্পা.)। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন। প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা ,২০১৭, পৃ. ১৬৭।